# আমার ছাত্র

(গল্পগ্রন্থ – নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব)

মানুষের প্রতি মানুষের এই যে হিংসা, এই যে উলঙ্গ বর্বরতা আচরিত হচ্ছে সভ্যতার নামে, শত বৎসরের শিক্ষা সংযম এক মুহূর্তে যাতে করে তৃণের মতো উড়ে গেল, উদগ্র লোভ হিংসা ও লালসার এই যে নগ্ন মূর্তি দেখা গেল চোখে,—তাতে দমে গেলে চলবে না। মানুষ আছে এখনো, মানবতা আছে, মনুষ্য সমাজ থেকে লজ্জায় মুখ ঢেকে বিদায় নেবার সময় ভগবান এদেরই দিকে ফিরে ক্ষীণ আশ্বাসের বাণী শুনতে পান, শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ান।

আমাদের গণেশদাদার কথা বলবার যোগ্য বলে এতদিন ভাবতামই না, কিন্তু আজ দেখচি গণেশদাদার ছবি আমার মনের পটে মস্ত বড় হয়ে ফুটে উঠেচে। এর আর একটা কারণ যে গণেশদাদা আমার ছাত্র।

গণেশদাদার নাম গণশা মুচি। আমাদের গ্রামের মুচিপাড়ার ছোট্ট খড়ের চারচালা ঘরে দুটি গরু ও চার-পাঁচটি বাছুর এবং স্ত্রী-পুত্র নিয়ে, উঠানে লাউমাচাপুঁইমাচা বানিয়ে, পুনকে নটেশাক বুনে, মেটে আলু ও বুনো ওল তুলে হাটে বিক্রি করে সংসার চালাতো।

যখন পাঠাশালায় পড়ি, তখন হরিশ জ্যাঠামশায়ের বাড়ি গণেশ মুচি কৃষাণের কাজ করে। আমরা গণেশদাদা বলে ডাকতাম, অন্যলোকে বলতো গণশা মুচি। মিশকালো, দোহারা গড়ন, মুখে একপ্রকার শান্ত দীন ভাব, লাজুক-নম্র চোখ দুটি, সর্বদাই যেন অপ্রতিভ, যেন কি একটা মহা অপরাধ করে ফেলেচে সে।

হরিশ জ্যাঠামশায় কড়া-প্রকৃতির গ্রাম্য গাঁতিদার। গণেশদাদাকে ডেকে বলতেন—এই গণশা-বাবলাতলার জমিতে দোয়ার দেওয়া হয়েচে?

গণেশ অমনি হাত কচলাতে কচলাতে বলতো—আজ্ঞে না, বাবাঠাকুর। কাল তো মোটে—লাঙল দেলাম—

—হারামজাদা, এতদিন ঘুমুচ্ছিলে নাকে তেল দিয়ে? কবে বলিচি চষতে ও ভুঁই?

—জমিতি লাঙল না লাগলি কি ক-অ-রবো বাবাঠাকুর! আজ সাঁজবাতির মদ্যি দোয়ার দিয়ে দেবানি—

—না দিলে জুতিয়ে তোমার আজ হাড় খুলে নোব মনে থাকে যেন।

গণেশদাদা আমরা যেখানে খেলা করচি সেখানে এসে হেসে বলতো—বাবাঠাকুর চটে গিয়েচেন।

আমি বলতাম—ও গণেশদাদা, ইংরিজি জানো?

—ইন্‌জিরি? কনে থেকে জানবো? মুই কি লেখাপড়া জানি?

—শিখবে?

—শিখিয়ে দাও দাদাঠাকুর তো শিখি—

—শেখো—ওভার মানে ওপর।

—কি?

—ওভার মানে ওপর, উড মানে কাঠ, কাউ মানে গরু—

গণেশদাদা মুখস্থ করতে লাগলো। ইউ.পি. পাঠশালায় কুঞ্জ মাস্টারের শেখানো যত বিদ্যা আমার মাথায় ভিড় করে তাদের উগ্রতায় আমাকে ব্যতিব্যস্ত করছিল, তা সবগুলো গণেশদাদার ঘাড়ে না চাপাতে পারলে যেন আমার নিস্তার নেই। সেই থেকে গণেশদাদার ইংরিজি শিক্ষার ভার আমি স্বহস্তে গ্রহণ করলাম। গোটা ওয়ার্ডবুকখানা গণেশদাদাকে কণ্ঠস্থ করাবার সে কী দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা আমার! মুখে মুখে শেখানো ছাড়া অবিশ্যি অন্য উপায় ছিল না, গণেশদাদার ভাষাতেই বলি, 'মা সরস্বতীর ঘরের ঝনকাট কখনো মাড়াইনি যে।'

গণেশদাদা কিন্তু শিখলো অনেক কথা। শ্রুতিস্মৃতির প্রাচীন উপায়ে প্রায় ডজনখানেক ইংরিজি শব্দের ঐশ্বর্যে সে ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠলো। আমিও শিষ্যগর্বে গর্বিত হয়ে উঠলাম রীতিমতো।

আমার সে-গর্ব মাঝে মাঝে বড় অশোভনভাবে আত্মপ্রকাশ করতো, গণেশদাদার লাজুকতা ও অপ্রতিভ ভাবকে আরো বাড়িয়ে। যেমন একটা উদাহরণ দিই। হরিশ জ্যাঠামশায়ের বাড়ি তাঁর বড় ছেলে ফুটুদাকে বিয়ের জন্য কন্যাপক্ষ দেখতে এসেচে—দু'তিনটি ভদ্রলোক, শ্যামনগরের কাছে কোথায় বাড়ি। আমরা ছেলেরা বলাবলি করলাম শ্যামনগর অর্থাৎ শহরের দিকে যতই বাড়ি হোক বাছাধনদের, আমাদের অজপাড়াগাঁ বলে যে নাক সিঁটকোবেন তা হোতে দিচ্চিনে—দেখিয়ে দেবো এ গ্রামের একজন মুচি কৃষাণও ইংরিজি কেমন জানে। সেই ভদ্রলোকের দল যখন হরিশ জ্যাঠামশায়ের চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছে, তখন আমি গণেশদাদাকে ডেকে বললাম—এই দেখুন, এদের মাইন্দার কেমন ইংরিজি জানে—

তাদের মধ্যে একজন কৌতূহলের সুরে বললে—তাই নাকি! দেখি—দেখি—

আমি অমনি বলি—গণেশদাদা, ওভার মানে কি?

গণেশ হাত ওপরে তুলে বললে-ওপোর।

—ওয়াটার?

—জল।

—স্কাই?

—আকাশ।

ইত্যাদি।

এক ডজন শব্দের ক্ষীণ পুঁজি শেষ হোতেই আমি থেমে গেলাম। গণেশদাদার দিকে শহরের চালবাজ লোকদের সপ্রশংস দৃষ্টি পড়ুক—এই আমার ইচ্ছা। আমার উদ্দেশ্য সফল হল; শহুরে বাবুরা ওর দিকে চেয়ে চেয়ে বললে—বাঃ বাঃ, এ লোকটি তো বেশ! কি নাম তোমার? বেশ, এদিকে এসো—

ওরা চার আনা বকশিশ করলে তখুনি। অর্থকরী বিদ্যা বটে ইংরিজি।...

সেই থেকে গণেশদাদার কি উৎসাহ ইংরিজি শেখবার। সাতদিনের মধ্যে আর এক ডজন শব্দ কণ্ঠস্থ করে ফেললে।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে। শীতকাল। বাড়িতে রুটি হচ্চে, দুধ আর গুড় দিয়ে খাবো বলে মনে খুব ফুর্তি। এমন সময় পীতাম্বর রায় জ্যাঠামশায়ের বাড়ি হৈ-চৈ শুনে সেদিকে গেলাম। গিয়ে দেখি তার চণ্ডীমণ্ডপের সামনে লোকে লোকারণ্য। পীতাম্বর রায়, হরিশ জ্যাঠামশায়, নবীন চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা চণ্ডীমণ্ডপে বসে। পীতাম্বর রায় খুব চিৎকার করচেন ও হাত-পা নাড়চেন। উঠানের মাঝখানে গণেশদাদা মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে রয়েচে। ব্যাপার শুনে বুঝলাম, পীতাম্বর রায়ের একটি গরু আজ দু'দিন হারিয়ে গিয়েছিল, আজ সেটা গণেশদাদার বাড়ির পেছনে মুচিপাড়ার বড় আমবাগানে (যার নাম এ গ্রামে গলায়-দড়ির বাগান) লতা দিয়ে বাঁধা ছিল এবং তার লেজ কে দা দিয়ে অনেকখানি কেটে দিয়েচে, ঝরঝর করে রক্ত পড়চে লেজ দিয়ে। এই অপরাধের সন্দেহ গিয়ে পড়েচে গণেশদাদার ওপর, কারণ প্রথমত মুচিরা গরুর চামড়া বিক্রি করে, দ্বিতীয়ত গরু গণেশদাদার বাড়ির পিছনে বাঁধা ছিল, তৃতীয়ত গণেশদাদা গরিব। সুতরাং গণেশদাদাই রাত্রে গরুটি কেটে চামড়া খুলে নেওয়ার উদ্দেশ্যে সেটাকে লুকিয়ে রেখেছিল তার বাড়ির পিছনের আমবাগানে। দায়ের কোপও সে-ই মেরেচে।

পীতাম্বর রায়ের ও হরিশ জ্যাঠামশায়ের যুক্তির মধ্যে যে ফাঁক ছিল, তা কারো চোখে পড়লো না। গণেশদাদার বক্তব্য প্রথমত সুসম্বদ্ধ নয়, দ্বিতীয়ত ভয়ে তার বুদ্ধিসুদ্ধি (যার আতিশয্য তার কোনোদিনই নেই) লোপ পেয়েছিল, সুতরাং আত্মপক্ষ সমর্থনে সে পটুত্বের বিশেষ পরিচয় দিল না।

উঃ, সে কি মারটাই মারলেন পীতাম্বর জ্যাঠামশাই ওকে পা থেকে চটি-জুতো খুলে! কত কাল কেটে গিয়েচে, দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর, কিন্তু আজও আমি চোখের সামনে গণেশদাদার যন্ত্রণা ও লজ্জাকাতর মুখ দেখতে পাই। মার বটে একখানা। শুধু শোনা যায় পীতাম্বর রায়ের তর্জন-গর্জন এবং চটাং চটাং চটি-জুতোর শব্দ গণেশদাদার পিঠে। পিঠ ফেটে রক্ত পড়তে লাগলো দরদর করে। তখনো পীতাম্বর জ্যাঠার থামবার চেহারা ছিল না, নীলু বাঁড়ুজ্যের ছেলে মণিদাদা, জোয়ান ছোকরা, দৌড়ে গিয়ে পীতাম্বর রায়ের হাত ধরে টেনে এনে নিরস্ত করলে।

আহা, গণেশদাদা বসে হাপুসনয়নে কাঁদতে লাগলো। আমি জানতাম গণেশদাদা নির্দোষী। আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো গণেশদাদার কান্না দেখে। ইচ্ছে হল পীতাম্বর জ্যাঠার কান ধরে কেউ এখুনি ঘুরপাক দেয় তো আমার মনের রাগ মেটে।

এ সব বাল্যকালের কথা।

সারা বাল্যকাল ধরে দেখেচি গণেশদাদা লোকের ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে দিনান্তে একথালা রাঙা আউশচালের ভাত কায়ক্লেশে জোগাড় করচে। তাতেই তার কি খুশি!

—ও গণেশদাদা, আজ কি খেলে?

আমি হয়তো প্রশ্ন করি।

তখন গণেশদাদা আস্তে আস্তে বলবে, যেন কল্পনার খাদ্যগুলো সে আবার পরম তৃপ্তির সঙ্গে আস্বাদ করছে—

—খ্যালাম? তা খ্যালাম মন্দ নয়। তোমার বড় বৌদিদি রেঁধেলো অনেকগুলি। খ্যালাম ধরো (আঙুলের পর্বে হিসেব রেখে) ভাত, শুল্‌কোর (গ্রামের নাম) নাঙা ডাটা দিয়ে, কুমড়ো দিয়ে, পেঁজ দিয়ে ঝিঙের ঝাল (তরকারি হিসেবে অদ্ভুত শুধু নয়, বিকট), বাগুন দিয়ে পেঁজ দিয়ে, কাঁচানংকা আর তেঁতুল। তা বেশ খ্যালাম—কি বলো?

—বেশ খেয়েচ, আবার কি খাবে?

কোনোদিন জিজ্ঞাসিত না হয়েও একগাল হেসে বলতো—দাদাঠাকুর, আজ খুব খ্যালাম—

—কি গো গণেশদাদা?

—কি বল দিনি?

গণেশদাদা সকৌতুকে আমার দিকে তাকায়।

—তা কি জানি? তুমি বলো!

—আজ তোমার বৌদিদি বড্ড করলে। উস্তের (উচ্ছে) শাক আর দয়াকলা দিয়ে একটা তরকারি আর পান্তাভাত।

খাবারটা লোভনীয় বলে মনে না হলেও মৌখিক তারিফ না করে উপায় নেই গণেশদাদার কাছে।

খাওয়ার তো এই দশা—পরনে ময়লা ছেঁড়া কাপড় কিংবা গামছা ছাড়া তো গণেশদাদার ছবি মনে করতে পারিনে। অথচ... ব্রাহ্মণপাড়ার অর্ধেক কাজে গণেশকে না হোলে চলেই না। বেশির ভাগই ব্যাগার।

—ওরে গণশা, আজ উঠোনের কাঠগুলো ঘরে তুলে। দিয়ে আসিস তো?

—গণশা, গাছের নারকোলগুলো পেড়ে দিতে হবে ওবেলা।

—গরুটো পন্টে গিয়েচে রে, তুই দুপুরবেলা একবার এসে গরুটো আজ এনে দিবি—বুঝলি?

—গণশা, আমার গাছের দু-কাঁদি কাঁচকলা হাট থেকে বিক্রি করে দিতে হবে বাবা—শুধু মিষ্টিকথা—ব্যাস! ঐ পর্যন্ত! কখনো গণেশদাদা মুখ ফুটে একটা পয়সা মজুরি এ সব ফাইফরমাশ খাটার জন্যে চাইতো না। বরং বলতো—বেরাহ্মণ দেবতা, ওনাদের পা-ধোয়া জল খেলি স্বগ্‌গো। ওনাদের একটু সেবা করবো তার আবার পয়সা!

কিন্তু শুধু ব্রাহ্মণের নয়, আমি যে-কোনো জাতির সেবা করতে দেখেচি ওকে অম্লানবদনে। জেলে-পাড়ার অথর্ব বুড়ি বিন্দের মাকে তার সঞ্চিত তেঁতুলকাঠের গুঁড়ি কুড়ুল দিয়ে চ্যালা করে দিতে দেখেচি। কত ক্রিয়াহীন মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণপাড়ার চণ্ডীমণ্ডপগুলি যখন অলস যুবক ও প্রৌঢ়দের পাশা দাবা ক্রীড়ার বিবিধ ধ্বনিতে অথবা দিবানিদ্রাভিভূত ব্যক্তিদের নাসিকাগর্জনে মুখরিত, তখন গণেশদাদা কারো তেঁতুলগাছে তেঁতুল পেড়ে দিচ্চে, না হয় কারো কলাইয়ের গাছ-বোঝাই গাড়ি চালিয়ে খামারে আনচে। ঘামে ওর সারা দেহ ভিজে, মাথার চুল ধূলিধূসর, পেটে পেট লেগেচে, কারণ—এখনো খাওয়া হয়নি।

কখনো দেখিনি গণেশদাদা কারো সঙ্গে ঝগড়া করচে কিংবা চড়াসুরে কথা বলচে।

আমার বাল্যকাল কেটে গেল। কলেজে পড়ে দুটো পাস করে গ্রামে ফিরে যেতে পথেই গণেশদাদার সঙ্গে দেখা বেলতলার মাঠে। গণেশদাদা গরু চরাচ্চে মাঠের মধ্যে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে। পাশ দিয়েই আমার পথ। গণেশদাদাকে ডেকে বললাম—ও গণেশদাদা, চিনতে পারো?

—তা চিনতে পারবো না, দ্যাখোদিনি দা'ঠাকুর! কোলেপিঠি করে মানুষ করলাম আর চিনতি পারবো না? কত বচ্ছর দেখিনি। কোথায় ছিলে অ্যাদ্দিন আমাদের ভুলে?

—মামার বাড়ি। তুমি তো বুড়ো হয়ে গিয়েচ দেখচি। মাথায় চুল পেকেচে, হ্যাঁ গণেশদাদা?

—ওমা, তোমাদের কোলে করে মানুষ করলাম, তোমরই কত বড় হয়ে গেলে-মুই আর বুড়ো হবো না? বয়েস কি কম হোল?

—ভালো আছ, হ্যাঁ গণেশদাদা?

—হ্যাঁ ভালো। তোমরা সব ভালো?

গণেশদাদাকে এই বয়সে গরু চরাতে দেখে আশ্চর্য হলাম। কারণ পল্লীগ্রামে গরু চরানো হল বিষয়কর্মের প্রথম সোপান। সাধারণত বালকেরা এ কাজ করে থাকে—তারপরে ক্রমোন্নতি ধাপে ধাপে উঠতে শুরু করে। মোটামুটি সেটা এই রকম :—

১। গরু চরানো (১৭ বছর পর্যন্ত)।

২। জন খাটা (১৬/১৭ থেকে ত্রিশ বছর বয়েস পর্যন্ত)

৩। অপরের কৃষাণগিরি করা (২৫/৩০ থেকে চল্লিশ

পর্যন্ত)

৪। নিজের জমিতে চাষ-আবাদ করা (এ সৌভাগ্য সকলের ঘটে না)

৫। বাড়িতে ধানের গোলা বাঁধা (যেমন অনেকেই ব্যবসা করে কিন্তু ধনী হতে পারে না, তেমনি চাষ অনেকেই করে কিন্তু গোলা বাঁধতে পারে না। এ সৌভাগ্য ক্বচিৎ ঘটে চাষির ভাগ্যে)

৬। কিন্তু এ লিখচি কেন, এ ভাগ্য সকলের হয় না—ব্যবসাদার মাত্রেই কি টাটা বিড়লা হয়? তবুও এটার উল্লেখ করতেই হবে—প্রত্যেক চাষির স্বপ্ন, প্রত্যেক রাখালের অলস-মধ্যাহ্নের স্বপ্ন, প্রত্যেক দিনমজুরের বর্ষা-দিনে একহাঁটু জল-কাদায় ধান বপন করতে করতে ক্লান্তি অপনোদনের স্বপ্ন—এটি উল্লেখ না করলে চলবে না। সেটি হোল নিজে মহাজন হয়ে নিজের গোলা থেকে অপরকে ধান কর্জ দেওয়া।

এই উচ্চতম ষষ্ঠ স্তর প্রাপ্তি বহু পুণ্যের ফলে ঘটে।

যাক, কিন্তু গণেশদাদা এই বয়সে বিষয়কর্মের প্রথম সোপানটিতে কেন, এ প্রশ্ন আমার মনে না উঠে পারলো না। পাড়াগাঁয়ে এই বয়সেও যারা গরু চরায়, বুঝতে হবে তারা ভাগ্যলক্ষ্মী দ্বারা নিতান্তই অবহেলিত, তারা নিতান্তই অভাজন। এ প্রশ্ন গণেশদাদাকে করলাম না, যদি ও মনে কষ্ট পায়। আমার কিন্তু মনে বড় কষ্ট হল পক্বকেশ গণেশদাদাকে পাঁচন হাতে তালপাতার ছাতি মাথায় গরু চরাতে দেখে।

গণেশদাদা বললে বোসো বোসো দাদাঠাকুর, তামুক খাবা?

—ও শিখিনি।

—এতটুকু দেখিচি তোমারে। কত বড়ডা হয়ে গিয়েচ। হ্যাদে, জিগ্যেস করো দিনি সেই ইন্‌জিরি? মনে আছে কিনা দেখি!

ওঃ, অনেক দিনের কথা—উচ্চ প্রাইমারি পাঠশালার সেই দিনগুলি কতকাল আগে অতীতে মিলিয়ে গিয়েচে। আজ পনেরো বছর আগের ব্যাপার সেই গণেশদাদাকে ইংরিজি শেখানো। কি কি শিখিয়েছিলাম, তাই কি ছাই আমার মনে আছে?

গণেশদাদা কিন্তু হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে আছে আমার দিকে। বললাম—তুমি বলতে আরম্ভ করো।

—ওভার মানে ওপর—

—বেশ, বেশ—তারপর?

—তুমি জিগোও দাদা,—আমি বলি—

—জল?

—ওয়াটার।

—আকাশ?

—স্কাই।

—দুধ?

—মিল্ক।

গণেশদাদার মুখে বিজয়ীর গর্বিত হাসি। তুমি তো ঠকাতে পারলে না দাদাঠাকুর এতদিন পরেও, ভাবটা এই রকম। আমি ভাবচি, এ-ইংরিজি শিখে তালপাতার ছাতি মাথায় গোচারণরত গণেশদাদার কি উপকার হবে?

গণেশদাদা বললে—বলো—বলো—

—পিঁপড়ে?

—পিঁপড়ে? ওডা তো শিখোওনি দাদাঠাকুর—ও তুমি শিখোওনি। ঝা শিখিইলে, তা মুই অ্যাকটাও ভুলিনি। তা ওডা মোরে শিখিয়ে দ্যাও, পিঁপড়ের ইন্‌জিরি কি?

—অ্যান্ট।

—অ্যান্ট? অ্যান্ট-অ্যান্ট-অ্যান্ট-অ্যান্ট—

জিউলি গাছটার তলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য গ্র্যাজুয়েট আমি আমার পক্বকেশ গোচারণরত ছাত্রকে ইংরাজি ভাষার পাঠ দিতে দিতে বড্ড দেরি করে ফেলি, বেলা যায় দেখে গণেশই বললে—তুমি এস দাদাঠাকুর। মুই গরু করে জল দেখিয়ে আনি পোড়ার খালে—আজ অনেক কথা শেখলনি—এ সব দেশ মুরুক্ষুর দেশ,

ল্যাখাপড়ার কথা কেউ বলে না—মোর মতো ইন্‌জিরি ক'জনে জানে, ওই তো রাখাল ছোঁড়ারা গরু চরাচ্চে, কই ডেকে শুধোও না জলের ইন্‌জিরি, ধানের ইন্‌জিরি—সব মুরুক্ষু দাদাঠাকুর—সব মুরুক্ষু—

—পোড়ার খালে মাছ পড়চে আজকাল গণেশদাদা?

—ওই হচ্চে দুচারটে—বান, ফলুই, তেচোকো—চলো না একদিন ধত্তি যাই—

—যাবো—দু-একদিন পরে।

—ঝে ক'ডা দিন গাঁয়ে থাকবা, মোরে শেখাবা কিন্তু—

—নিশ্চয়ই। এবার তোমাকে চার ডজন ইংরিজি কথা না শিখিয়ে আর—

—তোমাদের বাপ-মায়ের আশীব্বাদে ঝা মুই শিখিচি, তাতেই মোর সামনে কেউ দাঁড়াতি পারে? ওই তো হিবু ঘরামির ছেলে ওসমান গরু চরাচ্চে—ডেকে শুধোও না—

গণেশদাদা দূরে গোচারণরত একটি তেরো-চোদ্দো বছরের বালকের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

গ্রামে এসে গণেশদাদার কথা লোককে জিজ্ঞেস করলাম—ওর অবস্থা এত খারাপ হোল কেন? কারণ শুনলাম ওর দুই ছেলেই মারা গিয়েচে। বুড়ো হয়েচে বলে লোকের বাড়িতে কৃষাণের কাজে কেউ রাখতে চায় না। জমিদারের দেনার দায়ে সামান্য একটু ভিটেসংলগ্ন জমি ছিল, তাও বিক্রি হয়ে গিয়েচে। নিজের লাঙল নেই বলে ভাগে চাষ করবার উপায় নেই—যার লাঙল নেই, তাকে বর্গা দেবে কে জমি? সুতরাং এ-বয়েসে বাধ্য হয়ে ওকে গরু চরাতে হচ্চে।

গণেশদাদার বাড়ি গেলাম একদিন। ও বসে বসে কঞ্চি চাঁচচে—ঝুড়ি বুনবে। ঝুড়ি তৈরি করে হাটে বেচলে পয়সা হয়, কিন্তু ও ঝুড়ি বুনচে পরের ব্যাগার—এ আমি জানি। এর একটা মস্ত কারণ, ওকে পরের বাঁশঝাড় থেকে কঞ্চি কেটে আনতে হয়—অপরে তার দামস্বরূপ নেয় একটা ঝুড়ি, না তো একটা গাছ-ঘেরা কঞ্চির ঠোঙা। গণেশদাদার ঘরে কঞ্চির ঝোঁপের বেড়া, চালে খড় নেই—একটা চালকুমড়ো লতা উঠিয়ে দিয়েচে চালে, চালকুমড়োর ফুল আর ফল যথেষ্ট হয়েচে, লতাগুলো চাল ছাড়িয়ে এদিক ওদিক ঝুলে পড়ে বাতাসে দুলচে, একটা ধাড়ি ছাগল ঘরের ছেঁচতলায় পরম তৃপ্তিতে কাঁটালপাতা চর্বণ করচে, ওর বৌ গৃহকর্ম করচে—বেশ লাগল আমার। ঘরে পেতল-কাঁসার সংস্পর্শ নেই—মাটির কলসি, মাটির হাঁড়ি সরা, মাটির ডাবর, মাটির ভাঁড়ে জল রাখা আছে। ভাত খায় কলার পাতায়, নয়তো চামটার বিলের পদ্মপাতায়। আমাকে বললে—চালকুমড়ো একটা নিয়ে যাও দাদাঠাকুর।

—ও আমি কি করবো?

—নিয়ে যাও, বেশ সুক্তনি করো তোমরা। মোরা সুক্তনি রাঁধতে জানিনে। বামুনবাড়িতে কত সুক্তনি খেইচি আগে। পস্কার লাগে—

—কেন, বৌদিদি সুক্তনি করতে জানে না?

—অত তেলমশলা কনে পাবো মোরা? দাদাঠাকুরের য্যামন কথা। ও সব তরকারি কি মোরা খেতে জানি, না পারি?

ওদের ঘরের দাওয়ায় একজন খুনখুনে বুড়ি ছেঁড়া কাঁথা গায়ে শুয়ে আছে, অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ করছিলাম। গণেশদাদাকে জিজ্ঞেস করাতে ও বললে—আরে ও সেই রতনের মা, ওরে চেনো না?রতন ঘর ছেড়ে পালিয়েচে এক বাগ্‌দি মাগীকে নিয়ে। ওর মা যায় কনে? কেউ দেখে না। দুদিন না খেয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে ছিল। তাই ওরে এনে রেখে দেলাম মোর এখানে। চকির ওপর না খেয়ে মরবে পাড়াপিরতিবাসী—চকি কি দ্যাখা যায়? তাই ওরে এনে রেখে দেলাম। যদি মোদের জোটে, তোমারও একবেলা জোটবে। তাও নড়তে

পারে না, জ্বর, ছর্দি, কাশি। একটু হুম্‌নেপাতি ওছুদ এনে দিয়েলাম যগানন্দপুরের ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে—দু আনা নিয়েল—তা যদি কোনো উপ্‌গার হল দাদাঠাকুর—তুমি জানো হমনেপাতি?

—না, আমি জানিনে। আচ্ছা আমি দেখবো এখন ওবেলা ওষুধের ব্যবস্থা।

—কি দেবো তোমারে দাদাঠাকুর ভাবচি—

—কিছু দিতে হবে না। তুমি কথা বলো আমি শুনি—

কিন্তু কথা কইতে গণেশদাদা জানে না। তার সংকীর্ণ জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করেছে আজ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর ধরে, সে যতই সামান্য হোক, বলতে জানলে তাই নিয়েই চমৎকার কথার জাল রচনা করা যেত যা আকাশকে বাতাসকে রাঙিয়ে দিতে পারতো, শুকনো ডালে ফুল ফোটাতে পারতো—চামটার বিলের পদ্মফুলের পদ্মগন্ধি রেণু আমার নাকে উড়িয়ে নিয়ে আসতে পারতো। গণেশদাদা সেসব পারে না। তবুও ওর সঙ্গ আমার এত ভালো লাগে! কথার দরকার হয় না, ওর নিরুপকরণ ও অনাড়ম্বর সাহচর্যই আমার মনে একটি মৌন লিরিকের আবেদন বহন করে আনে।

সেবার চলে আসার পর পাঁচ ছ'বছর হবে গণেশদাদার সঙ্গে আবার দেখা।

গণেশদাদার মাথার চুল পেকে একেবারে শনের নুড়ি হয়ে গিয়েচে, পিঠের দিকটা বেঁকে একটু কুঁজো হয়ে গিয়েচে সামান্য।

শরৎকাল। পুজোর ছুটি। সেবার নদীতে একটু বন্যার আভাস দেখা দিয়েছে। কাশফুল ফুটে আলো করেচে নদীর দুই পাড়। নদীর ধারের মাঠে গণেশ গরু চরাচ্চে, খুঁজতে খুঁজতে বার করলাম ওর মাথার চুল আর ওর চারিপাশে কাশফুল একই রকম দেখতে। বৃদ্ধ গণেশদাদা সেই পাঁচ-সাত বছর আগের মতো, তালপাতার ছাতি মাথায় দিয়ে লাঠি হাতে গরু চরাচ্ছে। কোঁচড় থেকে বের করে কি খাচ্ছিল, আমায় দেখে লজ্জিত সুরে বললে—সৈরভির মা দুটো চালভাজা দেলে, বললে, গরম গরম একখোলা নামিয়ে ফেললাম, তুমি দুটো নিয়ে যাও—তাই নিয়ে অ্যালাম। বেশ লাগে।—তা এলে কবে দাদাঠাকুর? আর দ্যাখো বড্ড বুড়ো হয়ে পড়িচি, তুমি আসচো, কিন্তু মুই বুঝতে পারলাম না। বলি, কেডা আসে বাবুপানা? চকি তেমন আর ঠাওর হয় না—

—চালভাজা খাচ্চ, দাঁত আছে?

—তা আছে তোমার বাপমায়ের আশীব্বাদে। বলি ও কথা যাক, বিয়ে-থাওয়া করেচ?

—না, বিয়ের আর বয়েস নেই।

—কি কথা বলো দাদাঠাকুর? তোমারে কোলে করে মানুষ করলাম, কালকের কাঁচা ছেলে, বয়েস ফুইরে গেল তোমার? ও কথা বোলোনি। মা লক্ষ্মীকে দেখে চক্ষু বুজোবো। বিয়ে করো—কি করচো আজকাল?

—চাকরি করচি।

—বেশ বেশ। মোদের শুনেও সুখ। তা বোসো। এই গাছটার ছিঁয়াতে বোসো—হ্যাদে, তোমরা টুপি পরো? বেনার ডাঁটার খাসা টুপি বুনি দিতি পারি। পস্কার সায়েবের টুপি। নেবা?

—না, আমি সায়েবের টুপি পরিনে।

—বোসো। জিরোও, বড্ড রোদ্দুর।

কি সুন্দর নীল আকাশ কাশফুলে ভরা বিস্তীর্ণ মাঠের ওপরে হুমড়ি খেয়ে আছে। সাধারণ ধরনের নীল নয়, সে এক অদ্ভুত ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের নীল। ওপার থেকে হু-হু হওয়া বইচে, গণেশদাদার মাথার সাদা চুল বাতাসে কাশফুলের মতো উড়চে। আমার কাছে ছবিটি বেশ লাগে।

গণেশদাদা এইবার চালভাজা খাওয়া শেষ করে নদীর পাড় বেয়ে জলে নেমে দু'হাতে আঁজলা করে জল খেয়ে। নিয়ে সরস তৃপ্তির সঙ্গে 'আ' বলে একটি দীর্ঘ স্বর উচ্চারণ করলে। আমার কাছে এসে বললে—তামুক খাবা?

—খাই নে।

—দাঁড়াও সাজি। মোর দা-কাটা খরসান তামাক, বড্ড তলব। কিছু নেই, শুধু তামাক আর গুড়। বাজারের তামুকে চুন মেশায়। বলি হ্যাদে দাদাঠাকুর, একটু শুধোও দিকি?

—কি?

—সেই ইন্‌জিরি! মুই মুখস্ত বলবো! ওভার মানে ওপর, ওয়াটার মানে জল, বাড মানে পাখি, বালির ইন্‌জিরি স্যান্ড, মাছের ইন্‌জিরি ফ্লাই—

—উঁহু—

—কি, মাছের ইন্‌জিরি ফ্লাই নয়?

—না! তবে কি অ্যান্ট?

—না, অ্যান্ট মানে পিঁপড়ে। মাছের ইংরিজি ফিশ, মাছির ইংরিজি ফ্লাই।

—হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। বলি হ্যাদে বয়েস হয়েচে আজকাল অনেক, সব কথা ঝক্করে মনে পড়ে না, বেস্মরণ হয়ে যাই। আর তুমি না এলি তো চর্চা হয় না, সব মুরুক্ষু—কার সঙ্গে ইন্‌জিরি বলবো বলো দিকি?

আর এক ডজন ইংরিজি শব্দ বসে বসে আমার জ্ঞানপিপাসু শুভ্রকেশ ছাত্রকে শিক্ষা দিলাম, সেই কাশফুল-ফোটা চরে বসে শরতের অপরাহ্নে আগের শেখা শব্দগুলোও একবার সে ঝালিয়ে নিলে মহা উৎসাহে। তারপর সেই বিদ্যার বোঝা বহন করে সেই বছরের মাঘ মাসে নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে গণেশদাদা পরলোক যাত্রা করলে। পরবৎসর পুনরায় দেশে ফিরে গিয়ে আর ওকে দেখতে পাইনি।

কি বৈষয়িক উন্নতির দিক থেকে, কি ইংরিজি শিক্ষার দিক থেকে গণেশদাদা সারাজীবন প্রথম সোপানের দিকেই রয়ে গেল বটে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওর মধ্যে এমন কিছু ছিল, যার সাহায্যে ও সব সোপান অতিক্রম করে, আমাদের অনেককে অতিক্রম করে, অনেক উঁচুতে গিয়ে পৌঁছেছিল। তাই আজকার দিনে বার বার তার কথা মনেপড়ে।